

ছোট গল্প

চিত্রকর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ময়মনসিংহ ইন্সকুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায় । বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল । কিন্তু , সব চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে । সে ঠিক করেছিল , ‘ পয়সা ’ করবই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে । সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত ‘ পয়সা ’ বলে । অর্থাৎ , তার মনে খুব- একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল ; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না ; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা , হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে-যাওয়া , মলিন-হয়ে-যাওয়া পয়সা , তাম্রগন্ধী পয়সা , কুবেরের আদিম স্বরূপ , যা রূপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পক্ষে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিণীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে । গানিব্যাগ্‌ওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা । সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌দুলাল ।

গোবিন্দর পৈতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সংবরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী , একটি চার বছরের ছেলে , কলকাতায় একটি বাড়ি , কিছু জমা টাকা রেখে গেলেন লোকান্তরে । সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল , সুতরাং তাঁর পরিবারের অন্তবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত । এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ , প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয় ।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর ‘ পরে । গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে – ‘ পয়সা করো । ‘

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী । স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি , বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে । শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে । ফুল ফল পাতা নিয়ে , খাবারের জিনিস নিয়ে , কাগজ কেটে , কাপড় কেটে , মাটি দিয়ে , ময়দা দিয়ে , জামের রস ফলসার রস জবার রস শিউলিবাঁটার রস দিয়ে নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস-রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না । এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে । কেননা , যা অদরকারি , যা অকারণ , তার বেগ আঘাতের আকস্মিক বন্যাধারার মতো – সচলতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল । মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ , সত্যবতী ভুলেই গেছেন , শোবার ঘরে দরজা বন্ধ , একতাল মাটি চটকে বেলা কাটছে । জ্ঞাতিরা বললে , বড়ো অহংকার! সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই । এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে , সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন । আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত । কিন্তু , তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না । এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না । তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন , এটা দেখে তাঁর হাসি পেত , সে হাসি স্নেহরসে ভরা । এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন । মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল – ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ , কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয় । পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত , কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না । সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত ; অনুগত লোকদের ‘ পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না । জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা , নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের ‘ পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেন নি । সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন । মাঝে মাঝে আদালত থেকে

ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ , কিছু রঙিন রেশম , রঙের পেনসিল কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধুকটার ‘ পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন । কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে দিয়ে বলতেন , “ বা , এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে । ” একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড বলে স্থির করলেন ; বললেন , “ সতু , এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই – বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার! ” মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা করে মনে মনে যে-রসটুকু পেতেন , স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস । সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন , বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য , এত প্রশ্রয়, আশা করতে পারতেন না । শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না । এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অভ্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না ।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন । মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে , তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকাও পার হয়ে যাবে । এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে । গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন , সর্বাত্মে এবং সকলের উপরে পয়সা । গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে , সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত ।

তবু নানা আকারে আহা-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল । তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না ক ‘ রে তার উপরে যদি একটা আব্রু থাকত তা হলে

ক্ষতি ছিল না । সত্যবতী মনে মনে জানতেন , এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয় – কিন্তু, সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না ; কেননা , যে চিত্তভাব সুকুমার , যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে , সেই সব চেয়ে অরক্ষিত ; তাকে আঘাত করা , বিদ্রূপ করা , সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যিক । এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন , সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি । সংসারযাত্রার পক্ষে এইসমস্ত অনাবশ্যিক সামগ্রী , ব্যয়ের ফর্দে ধরে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায় । তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনতেন । যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ করে । ভর্ৎসনার ভয়ে নয় , অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে । আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্প-রচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী । এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল । তাকে লাগল বিষম নেশা । শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না , খাতার পাতাগুলো অতিক্রম ক ‘ রে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে । হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে । পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না । খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল ।

এক দিকে শাসন যতই বাড়াতে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন । আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবারুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন , সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ । একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি – বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে , এমন-কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত । এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না – বড়োবারু

ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত । এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন , মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না ।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল । তারই প্রমাণ স্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগনে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন । অর্থাৎ, দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব দিয়ে খুব অউহাস্য জমালে । তারা যেরকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল । আশ্চর্য এই যে , এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল ; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে , লোকটা আর্টিস্ট হিসাবে ফাঁকি – এমন-কি , তার টেকনিকে সুস্পষ্ট গলদ । এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে । দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন, দেখলেন , মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই । ব্যাপারখানা ধরা পড়ল । রঙ্গলাল বললেন , “ এতদিন পরে দেখা গেল , গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টিমূর্তি তাজা বেরিয়েছে, এর মধ্যে দাগা-বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই , যে বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে । সব ছবিগুলো বে ‘ র করে আমাকে দেখাও । ”

কোথা থেকে বের করবে। যে গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন , এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে । রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন , “ এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব । ”

বড়োবাবু এখনো আসেন নি । সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন , বৃষ্টি পড়ছে ; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই , তার খোঁজ করতেও মন যায় না । আজ চুনিবাবু নৌকা-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন । নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল , হাঁ করে নৌকাটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব ; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে – কিন্তু মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয় , আর মেঘগুলোকে ‘ ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ ‘ বললে অত্যাুক্তি করা হবে । এ কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে , এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্সুয়োরেন্স্ আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না । চলল রচনা , আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন , আর ঘরের মধ্যে ওই মস্ত-চোখ-মেলা ছেলেটিও তইবচ ।

এদের খেয়াল ছিল না যে , দরজা খোলা । বড়োবাবু এলেন । গর্জন করে উঠলেন , “ কী হচ্ছে রে। ”

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল , মুখ হল ফ্যাকাশে । ছবি কোথায় লুকোবে তার জায়গা পায় না। বড়োবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন , পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায় । ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল । টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন, তাতে তিনি আরও অবাক – এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো । ছবিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন । চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন । সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন । ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর

মেকের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল । গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে ।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি । ঐরই ‘ পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন , এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন । আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র , ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন , “ কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে । ”

গোবিন্দ বললেন , “ পড়াশুনো করবে না ? আখেরে ওর হবে কী । ”

সত্যবতী বললেন , “ আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো । কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয় । ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার , মায়ের আশীর্বাদ । ”

গোবিন্দ বললেন , “ আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না , এ চলবে না কিছুতেই । আমি কালই ওকে বোর্ডিঙ-স্কুলে পাঠিয়ে দেব – নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে । ”

বড়োবাবু আপিসে গেলেন । ঘনবৃষ্টি নামল , রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে ।

সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন , “ চল্ , বাবা । ”

চুনি বললে , “ কোথায় যাবে , মা । ”

“ এখান থেকে বেরিয়ে যাই । ”

চিত্রকর

রঙ্গলালের দরজায় এক-হাঁটু জল । সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে
দুকলেন ; বললেন , “ বাবা , তুমি নাও এর ভার । বাঁচাও এ ‘ কে পয়সার
সাধনা থেকে । ”